actionaid

কোভিড-১৯

এর প্রভাব:
কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ ও উৎপাদকের সার্বিক জীবনযাত্রা বিষয়ক অনুসন্ধান

অমিত রঞ্জন দে
ডেপুটি ম্যানেজার, একশনএইড বাংলাদেশ

কৃতজ্ঞতা

এই উদ্যোগ সফল করতে, প্রতিবেদন বিশ্লেষণ, সম্পাদনা ও চূড়ান্তকরণে যারা সর্বোতভাবে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেনঃ

একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগী সংগঠনসমূহ, কেন্দ্রীয় কৃষক মৈত্রী ও খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্কের মাঠ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দসহ

রেজাউল করিম সিদ্দিক রানা

সহসভাপতি, খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক(খানি);

নুরুল আলম মাসুদ

সাধারণ সম্পাদক, খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক(খানি);

মো: মনির আহমেদ

সভাপতি, কেন্দ্রীয় কৃষক মৈত্রী;

তানজীর হোসেন

লিড, রেজিলেন্স ও ক্লাইমেট জাস্টিস, একশনএইড বাংলাদেশ;

শমশের আলী

ম্যানেজার, ল্যান্ড রাইটস ও ন্যাচারাল রিসোর্স, একশনএইড বাংলাদেশ;

মো: খায়রুজ্জামান

ডেপুটি ম্যানেজার- একশনএইড বাংলাদেশ;

এবং **বারেক হোসেন মিঠু**।

তাদের সবার আন্তরিক সহযোগীতার জন্য কৃতজ্ঞ।

ভূমিকা

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার চালিকাশক্তি হচ্ছে কৃষক, মৎস্যজীবী, গবাদি পশু-পাখির খামারী ও গৃহস্থ। বর্তমানে কৃষক, মৎস্যজীবী, গৃহস্থ ও খামারীদের অবমূল্যায়ন, দেশের কৃষিজমি ও কৃষি ভর্তুকির হ্রাসকরণ, বীজের বাণিজ্যিকীকরণ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবসায়িদের আধিপত্য, কৃষিজাত, মৎস্য ও খামারীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় ফড়িয়া ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম, অপরিহার্য ফসলের পরিবর্তে অর্থকারী ও বাণিজ্যিক ফসলের অধিকতর চাষ, জলাভূমি অ-মৎস্যজীবীদের দখলে, পর্যাপ্ত পরিমানে খামারীদের উৎপাদিত পণ্য থাকার পরেও বিদেশ থেকে আমদানী করে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ইত্যাদি আগ্রাসণের পরেও কৃষক, গৃহস্থ, মৎস্যজীবী ও খামারীগণ বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক, গৃহস্থ , মৎস্যজীবী ও খামারীগণ নিরবচ্ছিন্নভাবে সারাবছর দেশের মানুষের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টির যোগান দিয়ে আসছে। তারপরও ক্ষুদ্র কৃষক, মৎস্যজীবী ও খামারীদেরকে নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করেই টিকে থাকতে হয়। কিন্তু এবারের লড়াইটা অন্যরকম। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে গোটা দুনিয়ার মানুষ আজ আতঙ্কিত। সবকিছু কেমন স্থবির হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা ক্রমান্বয়ে ঘণীভূত হয়ে উঠছে। বিপর্যস্ত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন এ সময়ে ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক কৃষক এবং খামারীদেরকে আরো কঠিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হচ্ছে। তাদেরকে একাধারে করোনার হাত থেকে বাঁচার জন্য যুদ্ধ করতে হচ্ছে, আবার নিজের জীবিকা এবং মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জীবন বিপন্ন করে মাঠে কাজ করতে হচ্ছে। তাদের অনস্বীকার্য অবদানের প্রেক্ষিতে বাজার ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধতা থাকার পরও দেশ বৈশ্বিক মহামারী এই নভেল করোনা পরিস্থিতিতেও খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলায় সক্ষম হয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে যেসব কারণে কৃষিপণ্য ও খামারজাত পণ্য বাজারজাতকরণ ও যথাযথ সংরক্ষণে কৃষকগণ বৈরী পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরাসহ কৃষকের পরামর্শসমূহ নীতি নির্ধারকদের কাছে উপস্থাপনের জন্য এই অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

গবেষণার পদ্ধতি

করোনা পরিস্থিতি যখন ভয়াবহরূপ ধারণ করেছে, ঠিক সে সময়ে এই সমস্ত কৃষক ও খামারীদের প্রকৃত অবস্থা কি, তারা কি ধরনের বিড়ম্বনার মধ্যে আছেন তা বোঝার জন্য রংপুর, বরিশাল, খুলনা, ঢাকা, রাজশাহী, সিলেট, চট্টগ্রাম এই ৭টি বিভাগের মোট ১৪ টি জেলার ১৭ টি উপজেলার ১৫১ জন কৃষকের কাছে একটি প্রশ্নপত্র প্রেরণ করে এবং ফোনালাপের মাধ্যমে যে চিত্র উঠে এসেছে তা এখানে তুলে ধরা হলো। তবে সব প্রশ্ন সবার জন্য প্রাসঙ্গিক না হওয়ায় সবাই সব প্রশ্নের উত্তর দেন নাই। সেক্ষেত্রে যে প্রশ্নের উত্তর যতজন দিয়েছেন তার ভিত্তিতে শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ এর স্বাস্থ্যবিধির কারণে স্বশরীরে গিয়ে কৃষক ও খামারীদের নিকট হতে তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। সকল তথ্যই মোবাইল ফোন ব্যবহার করে মাঠ পর্যায়ের কৃষক নেতাদের সাহায্যে সংগ্রহ করতে হয়েছে। ফলে অধিক সংখ্যক কৃষকের তথ্য সন্নিবেশিত করা সম্ভব হয়নি। তদুপরি কৃষকের সাথে অত্যন্ত যত্ন সহকারে নিবিড় ফোনালাপ ভিত্তিক এই প্রতিবেদন সময়ের প্রয়োজন মেটাতে এবং ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা প্রদানে সক্ষম হবে বলে আশা রাখি। তারপরও আপনাদের যেকোনো পরামর্শ সদরে গ্রহণের প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

সম্পাদনায়:
একশনএইড বাংলাদেশ

গবেষণার সময়:
৫ এপ্রিল থেকে ২৫ এপ্রিল ২০২০

সহায়তায়:
কেন্দ্রীয় কৃষক মৈত্রী ও খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক

actionaid

কোভিড-১৯ এর প্রভাব:

কৃষিপণ্য, বাজারজাতকরণ ও কৃষকের সার্বিক জীবনযাত্রা বিষয়ক অনুসন্ধান প্রতিবেদন

সচেতনতা

প্রথমেই আমরা কৃষক-জেলে-খামারী এবং তাদের পরিবার যাতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া থেকে নিজেকে নিরাপদে রাখতে পারে সে বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে জানার চেষ্ট করেছি। সেবিষয়ে কথা বলতে গিয়ে ২৭ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষেধ, ৯ শতাংশ বলেছেন জনসমাগমস্থলে যাওয়া নিষেধ, মাত্র ৪ শতাংশ বলেছেন কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

৪০ শতাংশ কৃষকের করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা সম্পর্কে তেমন কোনো বাস্তবতা নেই বলে জানিয়েছেন; কারণ, তাদের গ্রামে কোন করোনাভাইরাস আক্রান্ত কেউ নাই। এছাড়াও দোকানপাট একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত খোলা রাখা, বাইরে বের না হওয়া, সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা, সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, মাস্ক ব্যবহার করা, বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কথাও বলেছেন সবাই।

জরুরি সহায়তা প্রাপ্তি

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে দেশব্যাপী চলমান লকডাউন কার্যকর করার জন্য কৃষক, জেলে, গৃহস্থদের সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। কৃষক-জেলে-গৃহস্থ এই সময়ে কি সহায়তা পেয়েছেন- সে প্রসঙ্গে ৫৩ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন তারা কোনো প্রকার সহায়তা পাননি। ৩২ শতাংশ বলেছেন তারা স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় প্রশাসনের নিকট থেকে সহায়তা হিসেবে খাদ্যসামগ্রী পেয়েছেন। এছাড়া পাঁচজন ১০ টাকা দরে চাল ও একজন কৃষি অফিস থেকে ভুট্টার বীজ পেয়েছেন। একজন বলেছেন সরকার এ সময়ে বিদ্যুৎ বিল প্রদানের হাত থেকে রেহাই দিয়েছেন এটাও তাদের জন্য এক প্রকার সহায়তা হয়েছে।

প্রতিটি দুর্যোগ-দুর্বিপাকে আমরা দেখেছি বেসরকারি পর্যায়ের বিশেষ অবদান থাকে। কৃষকরা বেসরকারি পর্যায় থেকে কি সহায়তা পেয়েছেন সে প্রসঙ্গে ৭৬ শতাংশ বলেছেন তারা বেসরকারি পর্যায় থেকে এখনো কোনো সহায়তা পাননি। ৮ শতাংশ বলেছেন বেসরকারি পর্যায় থেকে সতর্কীকরণ বার্তা হিসেবে লিফলেট পেয়েছেন, তারা মাইকিং করেছেন এবং বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। ৬ শতাংশ বলেছেন তারা এনজিও থেকে ত্রাণ সহায়তা পেয়েছেন। এ ছাড়া হাত ধোয়ার সাবান বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ব্যক্তি পর্যায় থেকে খাদ্য সহায়তা ও নিরাপত্তা সামগ্রী পেয়েছেন এবং স্থানীয় যুবকদের নিকট থেকে সাবান, মাস্ক, স্যানিটাইজার সহায়তা পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন কেউ কেউ।

বর্তমান সমস্যা চিত্র

কৃষকের সাথে যখন তার কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে সে বিষয়ে কথা বলেছি, তখন তারা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ কৃষক মাঠ থেকে রবিশস্য ঘরে তোলার আগেই লকডাউন শুরু হয়ে গেছে। এই লকডাউনের কারণে শ্রমিক স্বল্পতা দেখা দিয়েছে, ফলে শস্য ঘরে তুলতে সমস্যায় পড়ছেন বলে জানিয়েছেন ৪৯ শতাংশ, পর্যাপ্ত গুদামের অভাবে বা গুদাম বন্ধ থাকায় শস্য সংরক্ষণ করতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন ৩২ শতাংশ, পরিবহন চলাচল স্বাভাবিক না থাকায় ফসল মাঠ থেকে ঘরে আনতে, বাজারে নিতে বা সংরক্ষণাগারে নিতে সমস্যায় পড়তে হয়েছে বলে জানিয়েছেন ৯৫ শতাংশ কৃষক। পণ্য বাজারজাতকরণে সমস্যায় পড়েছেন বলে জানিয়েছেন ৩৩ শতাংশ এবং পূর্বের তুলনায় কম দামে পণ্য বিক্রি করতে হয়েছে বলে জানিয়েছেন ৭২ শতাংশ কৃষক। এখানে একজন অংশগ্রহণকারীর একাধিক উত্তর দেয়ার সুযোগ থাকায় এখানে মোট ১০০ শতাংশ এর বেশি হয়েছে।

ফসল সংগ্রহে মোট অংশগ্রহণকারী কৃষকের ৪৯ শতাংশ শ্রমিক সমস্যার কথা বলেছেন। তাদের মধ্যে ৩৫ শতাংশ বাইরে থেকে শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না, ১৯ শতাংশ বলেছেন পরিবারের লোকজনও ভয়ে মাঠে যেতে চাইছে না।

শ্রমিক না পাওয়ায় ফসল মাঠেই নষ্ট হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ১৪ শতাংশ। বাকীরা বলেছেন শ্রমিকের মজুরি বেশি, খরিফ মৌসুমের ফসল বপনের জন্য শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না। চার জন জেলে বলেছেন নদীতে পর্যাপ্ত মাছ ধরা যাচ্ছে না এবং মাছ ধরার পর মজুরি ঠিকমত পাওয়া যাচ্ছে না।

মাঠ থেকে ফসল বাড়িতে নিয়ে আসার পর তা সংরক্ষণ বা গুদামজাতকরণের সমস্যায় পড়ছেন ৩২ শতাংশ কৃষক। যার ৮৫ শতাংশই বলেছেন গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা নেই, অনেক জায়গায় গুদাম থাকলেও তা বন্ধ থাকার কারণে তারা গুদামজাত করতে পারছেন না। ৮ শতাংশ কৃষক বলেছেন হিমাগারের অভাবে তারা আলু স্বল্পমূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। এছাড়া ছয়জন মৎস্যজীবী বলেছেন মাছ প্রক্রিয়াজাতকণের উপকরণ পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষ করে বরফ কল বন্ধ থাকায় তারা ব্যাপক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন।

লকডাউনের কারণে ৯৫ শতাংশ কৃষক পরিবহন সংকট পড়েছেন বলে মতামত দিয়েছেন। এদের মধ্যে ৬০ শতাংশ বলেছেন পণ্য পরিবহনের স্বল্পতা বা রাস্তা বন্ধ থাকার কারণে তাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে, ১৩ শতাংশ বলেছেন পরিবহন চলাচল স্বাভাবিক না থাকায় তারা স্থানীয় বাজারে স্বল্প মূল্যে ও স্বল্প পরিমানে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। ১২ শতাংশ বলেছেন পণ্য পরিবহনে খরচ বেশি লাগছে। এছাড়াও কেউ কেউ বলেছেন পরিবহন সংকটের কারণে পণ্য হিমাগারে-এ নেয়া যাচ্ছে না, তরমুজ, গবাদি পশু ইত্যাদি বিক্রি করতে পারছে না। ফেরি বন্ধ থাকায় কৃষি পণ্য পরিবহনে অসুবিধা হচ্ছে, জেলেরা তাদের মাছ শিকারের সরঞ্জামাদি ক্রয় করতে পারছেন না।

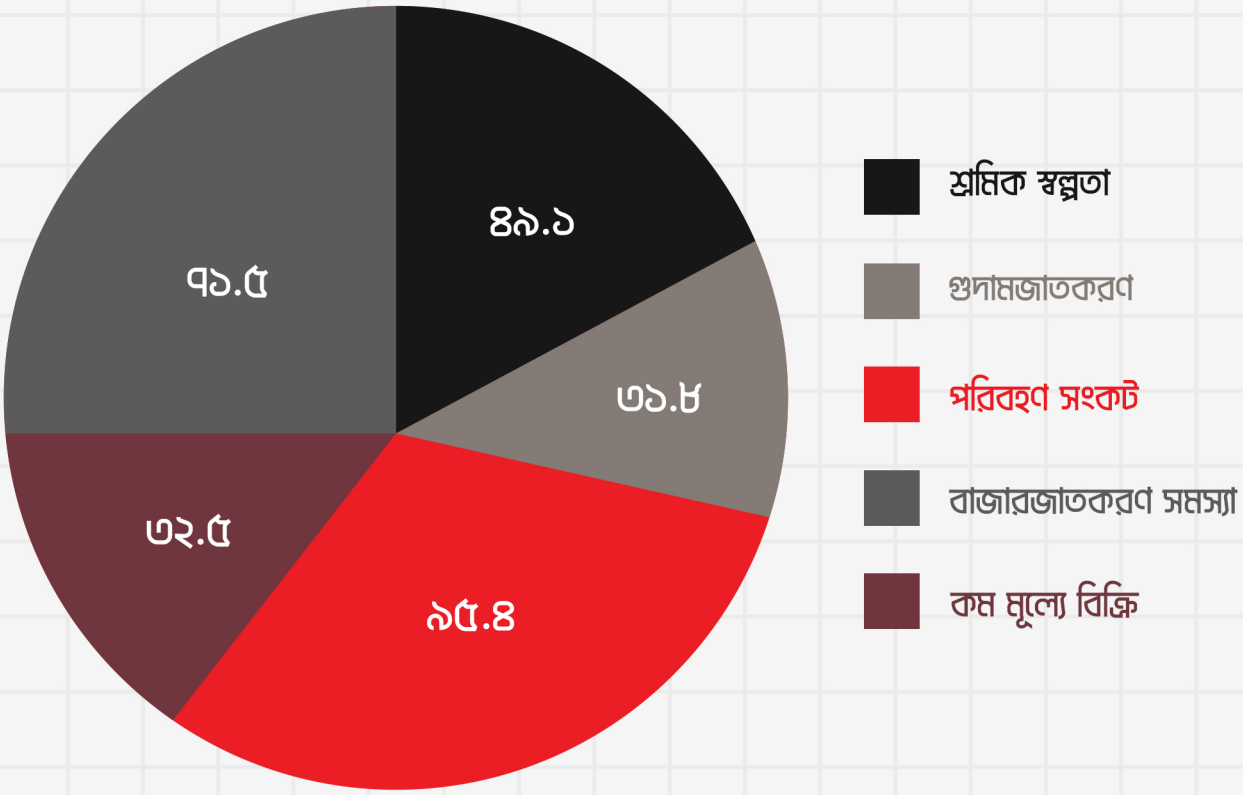

টেবিল-১: কৃষকের সমস্যার ধরণ

actionaid

পণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ৩৩ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন বাজারে পাইকার বা বড় ক্রেতা না আসতে পারায় অধিকাংশ পণ্যের চাহিদা কমে গেছে, ফলে বিক্রিও কমে গেছে। বিশেষ করে পচনশীল পণ্য কেনা-বেচায় বেশি অসুবিধা হচ্ছে। দুধের দাম কমে গেছে এবং বিক্রির অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তরমুজ বিক্রি করতে পারছে না, চাষীরা বরজ থেকে পান সংগ্রহ করতে পারছে না, পান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বরফকল বন্ধ থাকায় জেলেরা মাছ ধরার পর বরফ দিতে না পারায় মাছ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং ইতিমধ্যে অনেকের কাছে নগদ টাকার অভাব দেখা দিয়েছে।

উত্তরদাতাদের ৭২ শতাংশ বলেছেন তারা কম দামে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। কখনো কখনো তাদেরকে পণ্য ফেরত আনতে হচ্ছে এবং পণ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাজার বন্ধ থাকায় বা অল্প সময় খোলা থাকার কারণে পণ্যের দাম পাওয়া যাচ্ছে না, পণ্যের দামের তুলনায় পরিবহন খরচ বেশি দিতে হচ্ছে। কেউ কেউ বলেছেন পাইকার বা আড়তদাররা সিন্ডিকেট করে পণ্যের মূল্য কম দিচ্ছেন, পণ্য বাইরে পাঠাতে না পারায় দাম একেবারে কমে গেছে।

আলুর মূল্য নিয়ে কথা বলতে গিয়ে জেনেছি যে কৃষককে বাকিতে আলু বিক্রি করতে হচ্ছে, হিমাগারের অভাব ও পরিবহন সংকটে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে পারছে না। তবে আলুর দাম এখনো কমেনি বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে। আলুর দাম নিয়ে যে সমস্ত অংশগ্রহণকারী উত্তর দিয়েছেন তাদের ৭৩ শতাংশ বলেছেন আলুর দাম বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২৭ শতাংশ বলেছেন আলুর দাম কমে গেছে। পেঁয়াজের দাম নিয়ে ৬২ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন তাদেরকে পূর্বের তুলনায় কম দামে বিক্রি করতে হচ্ছে এবং ৩৮ শতাংশ বলেছেন তারা পূর্বের দামে বা তার চেয়ে বেশি দামেও বিক্রি করতে পারছেন।

আবার মিষ্টিকুমড়ার ক্ষেত্রে ৬৯ শতাংশ বলেছেন তাদেরকে কম দামে বাজারজাত করতে হচ্ছে এবং ৩১ শতাংশ বলেছেন তাদের এলাকায় মিষ্টিকুমড়া পূর্বের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। লাউয়ের দামের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ উত্তরদাতা বলেছেন তারা ঠিকমত দাম পাচ্ছেন না। ৮৪ শতাংশ উত্তরদাতাই বলেছেন তাদেরকে কম দামে লাউ বিক্রি করতে হচ্ছে এবং মাত্র ১৬ শতাংশ বলেছেন তাদের এলাকায় পূর্বের দামে এমনকি কখনো কখনো বেশি দামে লাউ বিক্রি হচ্ছে।

নিচের টেবিলের সাহায্যে পণ্যের মূল্য পরিস্থিতির একটা চিত্র তুলে ধরা হলো

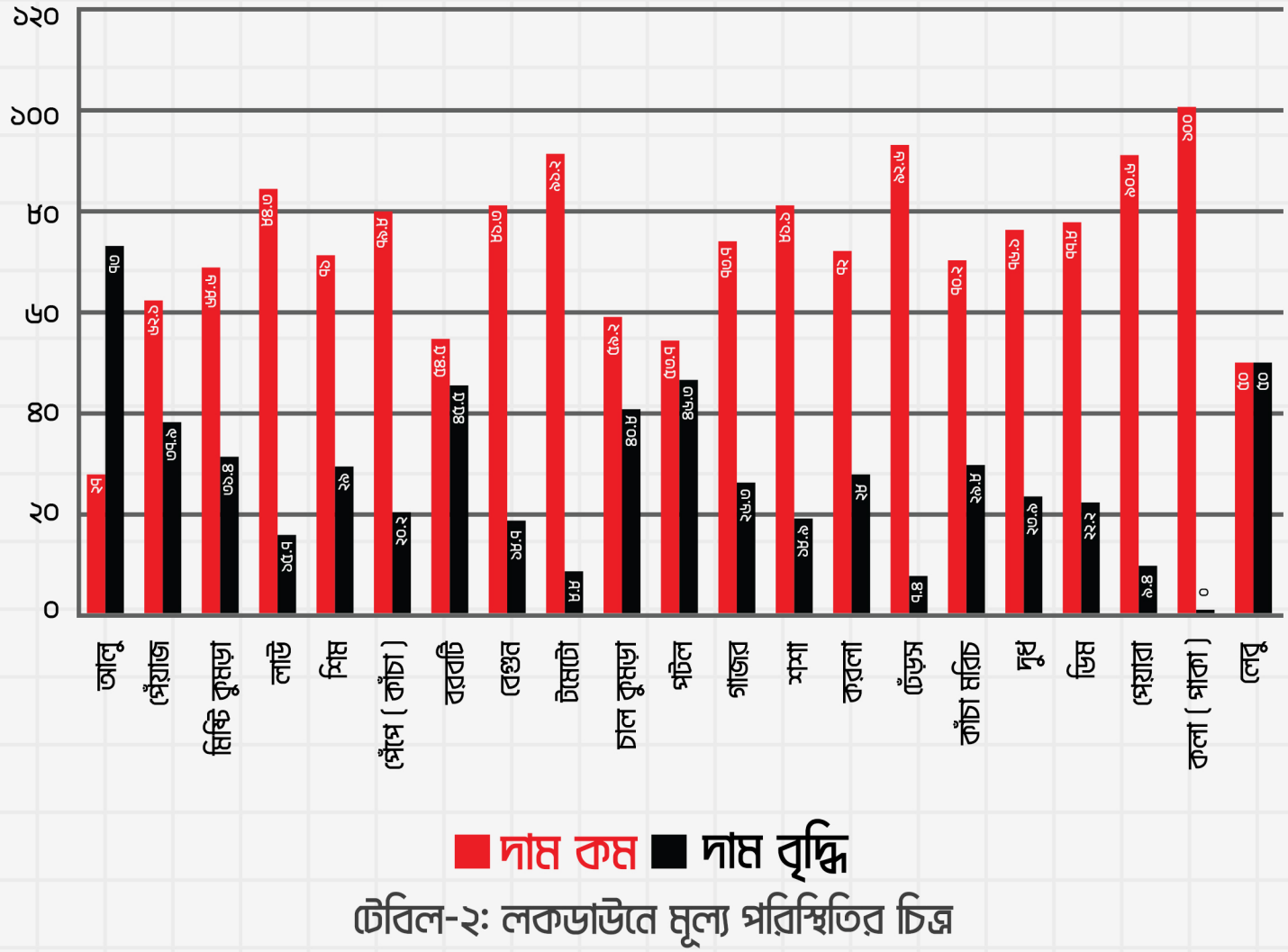

টেবিল-২: লকডাউনে মূল্য পরিস্থিতির চিত্র

actionaid

শিমের দাম নিয়ে যখন কথা বলেছি তখন ৭১ শতাংশ বলেছেন শিমের দাম কমে গেছে এবং ২৯ শতাংশ বলেছেন দাম বেড়েছে। অর্থাৎ বেশির ভাগই বলছেন, পূর্বের তুলনায় কমদামে শিম বিক্রি করতে হচ্ছে। এমনকি করোনা মহামারি শুরু হওয়ার আগে কেজি প্রতি ২০ টাকা করে শিম বিক্রি করতে পারলেও এখন তাদেরকে ৮-১০ টাকারও কমে বিক্রি করতে হচ্ছে। পেঁপের মূল্য নিয়ে ৮০ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন তাদেরকে কমদামে পেঁপে বিক্রি করতে হচ্ছে এবং ২০ শতাংশ বলেছেন তাদের এলাকায় সবজি হিসেবে পেঁপে পূর্বের দামে বা বেশি দামেও বিক্রি হচ্ছে।

বরবটির মূল্য পরিস্থিতি নিয়ে ৫৫ শতাংশ কৃষক বলেছেন তাদেরকে কম দামে বরবটি বিক্রি করতে হচ্ছে এবং ৪৫ শতাংশ বলেছেন পূর্বের সমান দামে এবং কোথাও কোথাও বেশি দামে বিক্রি করতে পারছেন বলে জানিয়েছেন। বেগুনের দাম প্রসঙ্গে ৮১ শতাংশ বলেছেন বেগুনের দাম কমে গেছে এবং ১৯ শতাংশ বলেছেন দাম ঠিক আছে বা আগের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। বেগুন শুধু কম দামে বিক্রি হচ্ছে তা না, বেশিরভাগই বলেছেন তাদেরকে ৫-৭ টাকা কেজি দরে বেগুন বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন।

টমেটোর বাজার আরো খারাপ। এ প্রসঙ্গে ৯১ শতাংশ বলেছেন, তাদেরকে কম দামে টমেটো বিক্রি করতে হচ্ছে এবং মাত্র ৯ শতাংশ বলেছেন তারা পূর্বের দামে বা বেশি দামে বিক্রি করতে পারছেন।

এদের মধ্যে একটা বড় অংশ বলেছেন তারা ২-৫ টাকা বা তারও কমে টমেটোর কেজি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন যা আগে তারা কমপক্ষে ১৫ টাকা দরে বিক্রি করতে পারতেন। এমনকি তারা টমেটো বিক্রি করে পরিবহন খরচ মেটাতে পারছে না বলেও জানিয়েছেন।

চালকুমড়ার দাম নিয়ে ৫৯ শতাংশ বলেছেন চালকুমড়া কম দামে বিক্রি করতে হচ্ছে এবং ৪২ শতাংশ বলেছেন পূর্বের দামে বা বেশি দামে বিক্রি করছেন। পটোলের দাম নিয়ে ৫৪ শতাংশ মতামত দিয়েছেন যে তাদেরকে কমদামে এবং ৪৬ শতাংশ সমমূল্যে বা বেশি দামে বিক্রি করতে পারছে।

গাজরের মূল্য নিয়ে ৭৪ শতাংশ কম দামে বিক্রি এবং ২৬ শতাংশ সমমূল্যে বা বেশি দামে বিক্রির কথা বলেছেন। আমরা শশার মূল্য নিয়ে যখন কথা বলেছি তখন ৮১ শতাংশ কম দামে এবং ১৯ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি করতে পারছেন বলে জানিয়েছেন। করলার দাম প্রসঙ্গে ৭২ শতাংশ বলেছেন তারা মারাত্মক ক্ষতির শিকার হচ্ছেন এবং ২৮ শতাংশ বলেছেন পূর্বের তুলনায় বেশি দামে বিক্রি করতে পারছেন।

ঢেঁড়শের দাম নিয়ে ৯৩ শতাংশ বলেছেন তাদের কম দামে বিক্রি করতে হচ্ছে। শুধু কম দামে নয় এদের অনেকেই বলেছেন যে ঢেঁড়শ বিক্রি করে ভ্যান ভাড়া ও খাজনার টাকা দেওয়ার পর কৃষকের হাতে আর কোনো টাকা থাকছে না। মাত্র ৭ শতাংশ বলেছেন তারা পূর্বের দামে বা বেশি দামে ঢেঁড়শ বিক্রি করতে পারছেন। কাঁচা মরিচের দাম নিয়ে ৭০ শতাংশ বলেছেন কম দামে আর ৩০ শতাংশ বলেছেন মরিচ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে।

সবজির দাম নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ উঠে এসেছে, তা হলো চরাঞ্চল বা যে সমস্ত এলাকায় যে ধরনের সবজি উৎপাদন হয় না সে সমস্ত এলাকায় সেটির মূল্য অনেক বেশি চড়া। এর অন্যতম প্রধান কারণ পরিবহন ব্যবস্থায় অচলাবস্থা বিরাজ করায় অন্য অঞ্চল থেকে সেখানে পণ্য আসতে পারছে না। যেমন বরগুনার পাথরঘাটা বা পটুয়াখালির গলাচিপা এলাকার উত্তরদাতারা বলেছেন তাদের এলাকায় অধিকাংশ সবজি আসে খুলনা, সাতক্ষীরা এবং যশোর অঞ্চল থেকে। কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে এসমস্ত অঞ্চল থেকে সেখানে কোন পণ্য যেতে পারছে না। যে কারণে অনেক ক্ষেত্রে ঢাকার চেয়েও বেশি দামে তাদের পণ্য ক্রয় করতে হচ্ছে। আলুর ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ স্থানে দাম বৃদ্ধির চিত্র উঠে আসার পেছনে বড় কারণ হিসেবে যে পর্যবেক্ষণটি উঠে এসেছে তা হলো ত্রাণের সাথে আলু দেয়া, আবার পেঁয়াজের দাম কমে যাওয়ার ক্ষেত্রে লকডাউনের পাশাপাশি নতুন পেঁয়াজ বাজারে আসায় তার একটা প্রভাব পড়েছে।

এরপর আসা যাক দুধ, ডিম, পেঁয়ারা, পাকা কলা ও লেবুর দাম প্রসঙ্গে। দুধের দাম নিয়ে ৭৬ শতাংশ বলেছেন কম দামে এবং ২৪ শতাংশ বলেছেন আগের দামে। তাদের মধ্যে কয়েকজন বলেছে, একদিকে দেশের তরল দুধ নষ্ট হচ্ছে, অপরদিকে বিদেশ থেকে গুড়োদুধ আমদানী করছে। তরল দুধ মিল্কভিটাসহ অন্যান্য কোম্পানি ক্রয় করে গুড়োদুধ প্রস্তুত করতে পারতো। তাহলে, দেশের একটি বড় অংশ, দুধ নিয়ে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হতো না। ডিমের ক্ষেত্রে ৭৮ শতাংশ বলেছেন কম দামে এবং ২২ শতাংশ বলেছেন তারা আগের দামে ডিম বিক্রি করতে পারছেন। আমরা যখন পেঁয়ারা নিয়ে কথা বলেছি তখন ৯১ শতাংশ বলেছেন কম দামে এবং মাত্র ৯ শতাংশ বলেছেন তারা বেশি দামে পেঁয়ারা বিক্রি করতে পারছেন। পাকা কলার দাম যখন জিজ্ঞেস করা হয় তখন ১০০ শতাংশই বলেছেন তাদেরকে কম দামে বিক্রি করতে হচ্ছে। যখন লেবুর দাম নিয়ে কথা বলেছি তখন একটু ভিন্নচিত্র বেরিয়ে এসেছে। লেবুর দাম নিয়ে ৫০ শতাংশ বলেছেন তারা কম দামে বিক্রি করছেন। আবার একইভাবে বাকি ৫০ শতাংশ বলছেন তারা বেশি বেশি দামে বিক্রি করতে পারছেন। অথচ কৃষক, গৃহস্থ আর খামারীদের উৎপাদিত পণ্য উৎসে কম দাম হলেও রাজধানীসহ বড় বড় শহরে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। তবে, করোনা প্রতিরোধে ভিটামিন-সি খাওয়ার বিষয়টি প্রচারিত হওয়ায় বাজারে লেবুর চাহিদা সবখানে বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৃষক খরিফ মৌসুমকে সামনে রেখে নতুন ফসল বপন করার তোড়জোড় করছে। কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে কৃষক স্বাভাবিকভাবে মাঠে কাজ করতে পারছেন না। তাদের অতিক্রম করতে হচ্ছে নানা ধরনের প্রতিকূলতা। কৃষক নতুন ফসল ফলানোর ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহের কথা বলেছেন তার মধ্যে অন্যতম বীজ, সার, কীটনাশক, জ্বালানি ও কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও জমিতে বীজ ছড়ানো বা চারা রোপনের সমস্যা। এসমস্যার কথা বলেছেন ৪৭ শতাংশ উত্তরদাতা। ৩০ শতাংশ বলেছেন কাজের লোকের অভাবে ফসলের পরিচর্যা করতে পারছেন না। ১২ শতাংশ বলেছেন নতুন ফসল বপন ও রোপনে দেরি হয়ে যাচ্ছে। ফসলের দাম না পাওয়া এবং উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় নতুন ফসল বপনে আগ্রহ হারিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ৭ শতাংশ কৃষক। মাত্র ৪ শতাংশ কৃষক বলেছেন তাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না।

সারাবিশ্ব যখন করোনা ভাইরাসে ঘরবন্দী তখনো ক্ষুদ্র কৃষক খাদ্য নিরাপত্তায় কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু কিভাবে কাজ করছেন সেটাই বিবেচ্য বিষয়। এ প্রসঙ্গে জানতে গেলে ৫৩ শতাংশ কৃষক, দিনমজুর বলেছেন তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাঠে ফসল উৎপাদনে কাজ করছেন, ফসল সংগ্রহ ও ভোক্তার কাছে পণ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখতে কাজ করে যাচ্ছেন। এমনকি নিরাপত্তা উপকরণ ব্যবহার ছাড়াই তারা মাঠের ফসল সংগ্রহ ও নতুন ফসলের চাষ করছেন। ২১ শতাংশ বলেছেন, নিজের পরিবার ও দেশের কথা চিন্তা করে খাদ্য উৎপাদন করতে হয়। অন্যথায় খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হবে। ফসল উৎপাদন করে জীবিকা নির্বাহ করা আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু আমরা নিজের সুবিধামত কাজ করতে পারছি না। প্রশাসনের বেধে দেয়া সময়ের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। ১৪ শতাংশ কৃষক বলেছেন তারা শ্রমিকের অভাবে বর্তমানে কৃষি কাজ চালিয়ে যেতে পারছেন না। আবার ১০ শতাংশ কৃষক বলেছেন তারা বেকার বাড়ি বসে আছেন, তাদের কোনো কাজ নেই এবং তারা খাদ্য নিরাপত্তায়ও তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না।

এবারে করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি মোকাবেলায় তারা যেধরনের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন তা এখানে বিবৃত করছি। এক্ষেত্রে একজন উত্তরদাতার একাধিক উত্তর প্রদানের সুযোগ ছিলো। উত্তরদাতা কৃষকদের ৩৩ শতাংশ বলেছেন তাদের খাদ্য বা ত্রাণ সহায়তা প্রয়োজন। ৩০ শতাংশ বলেছেন খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে তাদেরকে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে ভালো বীজ, সারসহ উৎপাদনের উপকরণ সরবরাহ এবং কৃষি প্রণোদনা বৃদ্ধি করা দরকার। ২৩ শতাংশ উত্তরদাতা কৃষির জন্য বিশেষ ঋণ বা সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করার সুপারিশ করেছেন। ২৩ শতাংশ কৃষক আর্থিক সহায়তা প্রদনের কথা বলেছেন। ১৭ শতাংশ তার উৎপাদিত কৃষি পন্যের ন্যায্য দাম ও বাজারজাতকরণের সুব্যবস্থা করার কথা বলেছেন। এছাড়াও তারা সচেতনতা তৈরি, নিরাপত্তা উপকরণ- মাস্ক, স্যানিটাইজার, সাবান, বিলিচিং পাউডার সরবরাহ করা এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ ও সাধারণ চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার কথা বলেছেন। তারা বলেছেন সরকার যেন বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এবং পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়। কেউ কেউ সরকারকে কৃষকের পণ্য ক্রয় করে নেয়া এবং তা প্রয়োজনীয় স্থানে পৌঁছে দেয়ার কথা বলেছেন। তারা পরবর্তী ফসল না উঠা পর্যন্ত সকল প্রকার ঋণের কিস্তি বন্ধ রাখা ও ঋণের সুদ মওকুফ করে দেয়ার কথা বলেছেন। তারা ধান কাটার শ্রমিক ও মেশিন, গ্রামে সরকারিভাবে পাইকারদের জন্য কেন্দ্র স্থাপন এবং একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করার কথা বলেছেন।

বর্তমান সময়ের জন্য অনলাইন মার্কেটিং-এর ধারণাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে ৪০ শতাংশ কৃষক পাইকার বা ক্রেতার সাথে যোগাযোগ ও অনলাইন মার্কেটিং এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো, দাম বেশি পাওয়া যাবে বলে মন্তব্য করেছেন। ১৩ শতাংশ অনলাইন মার্কেটিং ও তার ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং সেক্ষেত্রে সরকার বা কোনো বেসরকারি সংস্থা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভালো হয় বলে জানিয়েছেন। তবে ২৯ শতাংশ বলেছেন এ সম্পর্কে তাদের তেমন কোনো ধারণা বা আগ্রহ কোনোটাই নেই এবং ১৭ শতাংশ উত্তরদাতা গ্রামে বা চরাঞ্চলে অনলাইন সুবিধা খুব বেশি কাজে লাগবে কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

সুপারিশসমূহ

এই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ফলাফল, কোভিড-১৯ এর সম্ভাব্য স্থায়ীত্বকাল এবং ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তাকে বিবেচনায় রেখে ক্ষুদ্র কৃষক এবং কৃষিকে চলমান রাখতে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করা হলো:

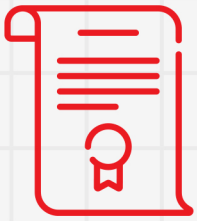

১. কোভিড-১৯ এর চলমান এবং পরবর্তী অবস্থানকে বিবেচনা করে কৃষি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, যাতে করে মৌসুমী কৃষি পণ্য, গবাদি পশু-পাখি ও মৎস্য খামারে উৎপাদিত পণ্য যথাসময়ে বাজারজাতকরণ ও হিমাগারে সংরক্ষণের উদ্যোগসহ ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা যায়। একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রস্তুত করা যাতে উৎপাদিত কোনো ফসল বা পণ্য কোনভাবেই নষ্ট হতে না পারে এবং কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত না হন। এ ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং অন্যান্য দুর্যোগকে বিবেচনা করে এ পরিকল্পনা নিতে হবে;

২. কৃষক ও খামারীদের উৎপাদিত পণ্য নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করতে কৃষিজাত ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া। যাতে শাক-সবজি, দুধ, ডিম, মাংস, মৌসুমী ফল ইত্যাদি অপচয় হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়; বিশেষ করে, চর ও হাওর অঞ্চলসহ সকল দুর্গম এলাকার নারী কৃষকসহ সকল কৃষকের জন্য পণ্য পরিবহনের সুব্যবস্থা করা এবং তাদের পণ্যের যথাযথ বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করা;

৩. সরাসরি ক্ষুদ্র ও দরিদ্র কৃষকের জন্য পণ্য উৎপাদনে প্রণোদনা এবং ভর্তুকিসহ আর্থিক সুবিধা সম্প্রসারণ করা। কৃষি কাজে ক্ষতিপূরণসহ খাস কৃষিজমি ও কৃষি উপকরণ সহজ লভ্য করা, বিশেষ করে বীজ, সার, কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণ কৃষকের আয়ত্বে রাখা, কৃষিতে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা: বিশেষত যে সকল উদ্যোক্তা কৃষক মূলধন হারিয়েছে তাদেরকে অফেরতযোগ্য অনুদান প্রদান করতে হবে যাতে তারা আবারো উৎপাদন কাজ শুরু করতে পারে;

৪. বর্তমানে মাঠে থাকা ফসল ঘরে তোলাসহ যেকোন দুর্যোগ পরিস্থিতিতে কৃষক বা ক্ষেত মজুররা যাতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় চলাচল করতে পারে তার ব্যবস্থা করা এবং কার্ডধারী কৃষকদের যানবাহন ভাড়া মওকুফ করা;

৫. কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে অনলাইন মার্কেটিং-এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করা এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আরও কার্যকরী ভূমিকার মাধ্যমে উৎপাদন এলাকায় পাইকার বা বড় ক্রেতাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা;

৬. প্রকৃত কৃষক ও খামারীদের তালিকা হালনাগাদ করা। সে অনুযায়ী প্রণোদনা, বিনাসুদে ও হয়রানি ব্যতিরেকে ঋণ এবং সরকারি সহায়তা প্রদান করা। কৃষকের পূর্বতন ঋণের সুদ মওকুফ করা;

৭. করোনা মহামারীসহ যেকোনো দুর্যোগকালীন সময়ে কৃষক, জেলে, খামারী ও ক্ষেতমজুরদের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। তাদেরকে নিয়মিত কমিউনিটি রেডিও, টেলিভিশনসহ অন্যান্য গণমাধ্যমে সঠিক তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে ভ্রান্ত ধারণা দূর করা এবং তার জন্য সহায়ক বার্তা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা;

৮. যতদিন পর্যন্ত কৃষি শ্রমিক, জেলে, গৃহস্থ, ক্ষুদ্র খামারীদের কাজের সুযোগ নিশ্চিত করা যাচ্ছে না ততদিন সরকারি ব্যবস্থাপনায় এবং সহায়তায় তাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থা নেয়া।

কেন্দ্রীয় কৃষক মৈত্রী
KKM
কৃষকের অধিকার আদায়ের মোর্চা

KHANI খানি
FOOD SECURITY NETWORK
BANGLADESH

actionaid

www.actionaidbd.org